বাংলা গানের আদিপর্ব : উনিশ শতকের বাংলা গান

বাংলা গানের আদিপর্ব অনেকটাই অনুমানের ব্যাপার, কেননা সুপ্রাচীন যুগ থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত বাংলা বিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যায় না। পদাবলী সাহিত্যের প্রসার আমরা নির্ণয় করতে পারি; পদাবলী কীর্তন কীভাবে গঠিত হয়েছিল, তার বিবরণও লিখিত আছে; কিন্তু বাংলার কাব্যসংগীত ধীরে ধীরে কীভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছে তার পরিচয় কোথাও ধরে রাখা হয়েছে বলে এতাবৎ কাল পর্যন্ত জানা যায় না। কোথাও উনিশ শতকের বাংলা গান আসলে কাব্যসংগীতের সংগঠন এবং তার আদিপর্ব জানতে গেলে পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে বাংলার লিরিক গান কীভাবে প্রচলিত ছিল তার উদাহরণ পাওয়া দরকার; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা দুর্লভ বা অপ্রাপ্য বললে অতিশয়োক্তি হয় না।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কাব্যসংগীত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে নাটকের মাধ্যমে। আমাদের প্রাচীনতম সংগীতের বিস্তারিত আলোচনা আমরা পাই ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে। তার আগেও নানান ধরনের গান ছিল; কিন্তু যখন থেকে নাটক একটা বড়ো আর্ট হয়ে উঠল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করল তখন থেকেই নাটকের ভিতর দিয়ে শুরু হল সংগীতের বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই কারণেই নাট্যশাস্ত্রে সংগীত একটা প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়েছে। একালে যেমন থিয়েটার সিনেমা থেকে গান জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সেকালেও সেরকমই ছিল। তখনকার দিনে সপ্তস্বরের বিভিন্ন বিন্যাসে, চর্তুমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক তালে, বাদী (অংশস্বর), সংবাদী, অনুবাদী প্রভৃতির যথাযথ সন্নিবেশে, নানারকম মেলডি প্রস্তুত করা হত। এইগুলিতেই গানগুলি রূপায়িত হত। এ-সব গানে বিবিধ মূর্ছনা, অলংকারও প্রযুক্ত হত। এদের পরিচয় ছিল জাতিগান। নাটকের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই গানগুলিকে প্রয়োগ করা হত। এই ধারাটিই পরে রূপান্তরিত হল রাগসংগীতে। এদেরও প্রয়োগ হত নাটকের বিভিন্ন ব্যাপারে। এরই নাম মার্গসংগীত। এই প্রকার সব গানই কিন্তু ছিল সংস্কৃত ভাষায়

রচিত। প্রাকৃত ভাষাও প্রচুর প্রচলিত ছিল। নির্দিষ্ট তাল ব্যতীত বহু কাব্যছন্দ অবলম্বন করেও অনেক গান গাওয়া হত। নাটকের মঞ্চে বা অন্তরালে নানা রস, নানা আবেদন, নানা ইঙ্গিতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে এই-সব গান রচিত হত। ক্রমে এরা এককভাবে বিভিন্ন আসরেও পুরুষ এবং মহিলা শিল্পীদের কণ্ঠে রূপায়িত হত। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল আদিযুগের কাব্যসংগীত।

মার্গসংগীত আখ্যা হলেও এই-সব গানের রূপায়ণে কাব্যের ধারাটি সুস্পষ্ট। প্রাচীন গৌড়-বঙ্গালে জাতি বা রাগসংগীতের প্রচুর প্রয়োগ ছিল, যার ফলে গৌড় বা বঙ্গাল আখ্যাযুক্ত জাতি বা রাগ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু, এই-সব গান যেহেতু খাঁটি সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতেরই অপভ্রংশে রচিত, সেহেতু এদের বাংলা গান বললে অসংগত হবে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভিন্ন প্রচলিত দেশভাষায় জাতি বা রাগের আরোপ হয়েছে—এরকম উদাহরণ পাওয়া যায় না; পেলে প্রাচীন বাংলা গানের একটা প্রধান সূত্র পাওয়া সম্ভব হত। অবশ্য বাংলায় মার্গসংগীত প্রচলিত থাকায় এর একটা প্রভাব যে থেকে গিয়েছিল সেটি সব সময়েই স্বীকার করতে হবে, তা নইলে প্রকৃত বাংলা গানে রাগাদির আরোপ কালক্রমে ঘটত না।

এই সুচারু রাগশিল্পের পাশাপাশি দেশী পর্যায়ের নানাবিধ সংগীত ক্রমেই সংগীতজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। এই-সব গান রাগসংগীতের আভিজাত্য না পেলেও জনসমাজের নিজস্ব বস্তু হিসাবে তাদের স্বীকৃতি লাভ করে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠতে লাগল। এই-সব গানকেই শাস্ত্রকারগণ প্রবন্ধসংগীত আখ্যা দিয়ে পৃথকভাবে পরিচিত করে গেছেন। কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে বাংলায় প্রচলিত প্রাচীন প্রবন্ধসংগীতের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। যে বিস্তৃত প্রবন্ধসংগীতের বিবরণ শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়, তার কতগুলি যে বাংলায় প্রচলিত ছিল তা অনুমানের বিষয়, কারণ সেই-সব নামের গান এদেশের সাংগীতিক ট্রাডিশনে পাওয়া যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিছু চর্যাগান প্রকাশ করে সেগুলিকে প্রাচীন বাংলার কীর্তন শ্রেণীর সংগীত বলে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুমান যথেষ্ট কষ্টকল্পিত। প্রথমত, চর্যা ছিল সর্বভারতীয় সংগীত। বিভিন্ন প্রদেশের আধ্যাত্মিক সাধকেরা তথা যোগীরা তাঁদের ভাষায় এই গান গাইতেন। নানা দেশের ভাষাতেই এই গান প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত, কীর্তনের ধরনে সকলে এক-সঙ্গে গাইলেও এর স্টাইলটা ছিল প্রধানত ভজনের মতো। এই ধরনের ধুয়া ধরে গান আরো বহু সংগীতেই দেখা যেত। এই অনুমানের মধ্যে সত্যি এইটুকুই যে সুপ্রাচীন বাংলা ভাষার কিছু-কিঞ্চিৎ নমুনা এদের মধ্যে পাবার সম্ভাবনা ছিল। চর্যা প্রবন্ধসংগীত হিসাবে খুব নগণ্য স্থান অধিকার করে

আছে, কাব্যসংগীত হিসাবে একে 'হাইলাইট' করার স্বপক্ষে কোনো তাৎপর্য নেই। বরঞ্চ, বসন্তরঞ্জন রায় যে গানের পুঁথিটি সংগ্রহ করেছিলেন তাতে সেকালের প্রবন্ধগানের রীতি কিছুটা ধরা পড়ে। এর নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ছিল কিনা সেটা সন্দেহের বিষয় এবং এই পালার গানগুলির যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে এটি যে ঝুমুর গানের রূপ ছিল না সেটি প্রায় অসন্দিগ্ধরূপেই বলা যায়। বসন্তবাবুর নিজের ধারণা ছিল এই গানগুলি ঝুমুর, কিন্তু এই পালার একটি গানও ঝুমুর গায়কদের সংগ্রহে পাওয়া যায় না এবং কোনো বিশেষজ্ঞও এর কোনো গানকে ঝুমুর বলে পরিচিত করতে পারেন নি। এটি নিঃসন্দেহেই পরবর্তীকালের কৃষ্ণযাত্রার আদিরূপ এবং একটি প্রাচীন নাট্যগীতির উদাহরণ হিসাবে এটি সার্থকতা অর্জন করতে পারে। যাই হোক, প্রবন্ধসংগীত সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, এইগুলিও ক্রমে রাগসংগীতের প্রভাব স্বীকার করে লিরিক হিসাবে সংগঠিত হতে লাগল এবং ক্রমে একাধিক প্রবন্ধ পর্যায়ের দেশী গান রাগসংগীতে পরিণত হয়ে গেল। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে ধ্রুপদ। মধ্যভারতের দেশীয় ভাষায় রচিত এক শ্রেণীর গান প্রধানত গোয়ালিয়রের প্রচেষ্টায় একটি উত্তম রাগসংগীতের স্বীকৃতি লাভ করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ধ্রুপদ মোগল দরবারের স্বীকৃতিতে ভারতীয় রাগসংগীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ক্রমে রাগসংগীতের লক্ষণগুলি দেশীয় গানসমূহে আরোপ করা হতে লাগল এবং দেশীয় ভাষার সংগীতগুলি রাগসংগীতের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সমর্থ হল। ধ্রুপদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে মোগল যুগের প্রথমভাগে যখন বাংলায় সুলতানী আমলের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলা প্রায় উত্তর বা পশ্চিম ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। গোয়ালিয়র এবং দিল্লীতে যখন ধ্রুপদের প্রসার প্রতিপত্তি গভীর, বাংলায় তখনো তৎপূর্ববর্তী সংগীতের প্রাধান্য চলেছে। এই ধারাটি যে কী ছিল সেটি ধারণা করা কঠিন নয়। এটি হচ্ছে জয়দেব-প্রতিষ্ঠিত গীতিরীতি। জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের সভা অলংকৃত করেছিলেন এবং গীতগোবিন্দ বঙ্গদেশ থেকেই সারা ভারতে প্রচার লাভ করেছিল।

গীতগোবিন্দ সংগীতালেখ্যটি রাগ এবং তালে নিবদ্ধ হলেও এটি সেকালকার রাগগীতির পরিচায়ক নয়, কেননা রাগগীতির কাঠামোটিই ছিল অন্যরকম। জয়দেব তাঁর গানগুলিতে মার্গতাল আরোপ করেন নি এবং রাগগীতির অন্যান্য লক্ষণও এতে ছিল না। এই রচনা একটি প্রকৃষ্ট প্রবন্ধসংগীতের উদাহরণ, কিন্তু ধ্রুপদের লক্ষণ বা নির্দিষ্ট কলিবিভাগ জয়দেবের পরিকল্পনায় দেখা যায় না। জয়দেব সহজ সুললিত সংস্কৃতে পদ রচনা করেছেন। এই ধারা অনুসরণ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলায় বহু গান রচিত হয়ে এসেছে। ক্রমে সংস্কৃত থেকে তৎকালীন বাংলায় এইরকম

পদ রচনা করা সুঃসাধ্য ছিল না এবং সেগুলি সংক্ষিপ্ততর করে এক-একটি বিশিষ্ট লিরিক রচনা করাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রচেষ্টারূপে গণ্য হতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেরকমই হোক-না কেন, বাংলায় পরিশীলিত লিরিক গান বা কাব্যসংগীতের মুখ্য প্রেরণা যে গীতগোবিন্দ থেকেই পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

একদিকে জয়দেবের পদাবলী থেকে যেমন কাব্যসংগীতের অনুপ্রেরণা পাওয়া গেল, অপর দিকে বৈষ্ণব পদাবলীও এই একই প্রভাব থেকে প্রবাহিত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে পদাবলীর ধারাটাকে কিছুটা স্বতন্ত্র বলে মনে হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রকৃতি, রসবৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যনিরূপণ, সবই জয়দেবের কাব্য থেকে আহরণ করা হয়েছে। মৈথিলী এবং বাঙালি পদকর্তারা তাঁদের রচনাগুলি কীভাবে রূপায়িত করতেন সেটা আমরা জানি না, তবে জয়দেবের প্রবর্তিত স্টাইলকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন বলেই মনে হয়। এই পরিচয়টা না পাবার হেতু বাংলায় পদাবলী কীর্তনের অভ্যুদয়।

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কয়েক দশক পরেই মহাজন-পদাবলীর প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ প্রদান করলেন পদাবলী-কীর্তনের সংগঠকগণ। এর সূত্রপাত হয়েছিল খেতরির মহোৎসবে, নরোত্তম ঠাকুরের প্রচেষ্টায়। তিনি তৎকালপ্রচলিত প্রবন্ধসংগীতের কিছু ধারা এবং উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত দেশী সংগীতাদির কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করে পদাবলী কীর্তনকে একটা আর্ট সংগীতে পরিণত করলেন। তারপর থেকে কীর্তন ধীরে ধীরে সমগ্র পদাবলী সাহিত্যকে গ্রাস করে সম্পূর্ণ অন্য একটা রূপ প্রদান করেছে এবং বহু নতুন নতুন তালও সৃষ্ট হয়েছে এই নব-রূপায়ণের উদ্দেশ্যে। পদাবলী সাহিত্যের উদ্‌গাতা বিদ্যাপতির প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়, তিনি পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভাবনা করেছিলেন মিথিলার রাজসভায় প্রচলিত নাটগীতির উন্নতি প্রচেষ্টায়। তাঁর সহযোগী ছিলেন, যাঁরা কথকতার সঙ্গে গান করতেন, তাঁরা। তিনি মিথিলায় প্রচলিত রাগসমূহ তাঁর পদে আরোপ করতেন এবং সম্পূর্ণ নিজের উদ্ভাবিত কাব্যছন্দে গান করতেন; তিনি দেশী বা মার্গতালের কিছুমাত্র পরোয়া করেন নি। তাঁর মতে কাব্যের ছন্দই তাঁর সংগীত-রূপায়ণের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি রাগ এবং ছন্দকে একই নামে নির্দেশ করতেন। যদি তিনি দশটি গান ভৈরবীতে রচনা করতেন তা হলে সেই দশটি গানের প্রত্যেকটিতে ছন্দ বিন্যাস হত স্বতন্ত্রভাবে, কিন্তু সেই ছন্দ বা তালও পরিচিত হত ভৈরবী নামে। এইভাবে একদা মিথিলার গীতে রাগ ও তাল একই নামে পরিচিত হত। এই রীতি বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল কিনা বলা সম্ভব নয়, তবে কাব্যসংগীতে তাল ব্যতিরেকে ছন্দের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছিল, এটা ঠিক। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে দেশীয় সংগীত যখন প্রাকৃত ভাষায় গাওয়া হত তখনো

কাব্যের ছন্দ অনুসারে গান করাকে শাস্ত্রীয়ভাবে স্বীকার করা হয়েছে; তোটক, পজ্ঝটিকা প্রভৃতি বহু ছন্দেই গান রচিত হত।

পরবর্তীকালে বাংলার কাব্যসংগীত বহু ধারার মধ্যে কিছু জয়দেবীয় রীতি এবং কিছু বৈষ্ণব পদাবলীর রীতিকে অনুসরণ করে এসেছে। অবস্থাটা যখন এমনি তখন বাংলার কাছে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। আকবরের সময় থেকে বাংলায় ধ্রুপদের পরিচয় বিস্তৃত হতে লাগল এবং শাজাহান-এর সময় বাঙালি রাজা-মহারাজদের গৃহেও ধ্রুপদীরা আশ্রয়লাভ করতেন। ক্রমে খেয়াল, ঠুংরি এবং পূর্বাঞ্চলের বহু বিচিত্র সংগীত পদ্ধতি বাংলায় প্রবেশ করতে লাগল। বাঙালিরা যেরকম গানের অনুরাগীই হোন-না কেন বহিরাগত গায়ক-গায়িকারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু বৈশিষ্ট্যই বাংলায় স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সব নানান ধারার মধ্যে কাওয়ালির একটি স্বতন্ত্র স্থান ছিল। মুসলমান আমীরদের গৃহে নিয়মিত কাওয়ালির অনুষ্ঠান হত। কাওয়ালেরা বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানেই গানবাজনা করতেন। কাওয়ালি গানের বেশ-কিছু রীতিনীতি সেকালের কবিগানের স্টাইলে দেখা যায়। চিতেন, পরচিতেন প্রভৃতি চড়া আওয়াজের গানের কায়দা-কানুন কাওয়ালি থেকেই আহরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। 'কাওয়াল' শব্দটিই 'কবিয়াল'-এ রূপান্তরিত হয়েছে কিনা, তাই বা কে বলবে। আর-একদিকে কবিগানে পদাবলীর বহিরঙ্গকেও বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যেটা দীর্ঘ পয়ার ভণিতা প্রভৃতি থেকে বোঝা যায়।

এইখানে আর-একটি প্রভাবকে স্বীকার করতে হয়, সেটি হচ্ছে ফার্সী সাহিত্যের পঠনপাঠন এবং সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের চর্চা। এই প্রভাব যে কীভাবে পড়েছিল সেটি বাইরে থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও ভিতরে ভিতরে তার কার্যকারিতাকে অস্বীকার করা যায় না। সেকালে কিছু কিঞ্চিৎ ফার্সী প্রত্যেক ভদ্রসন্তানকেই পড়তে হত। এইসব পাঠ্যের মধ্যে সাদীর গুলেস্তাঁ প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। ছোটো ছোটো ফার্সী চৌপদী ফার্সী সাহিত্যের প্রধান সম্পদ; মুসলমান পণ্ডিতগণ এই-সব চৌপদী সুর করে পাঠ করতেন। যাঁরা হাফিজ, রুমী, ফরিদুদ্দিন আত্তার প্রভৃতি বড়ো বড়ো কবিদের কবিতা পড়তেন তাঁরাও সেই-সব সুরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অপর দিকে সংস্কৃত চৌপদীরও অভাব ছিল না।

অমরুশতকের বহু কবিতা সেযুগে সমাদরের সঙ্গে অধ্যয়ন করা হত। এগুলি অবশ্য সুর করে পড়া হত না; কিন্তু এগুলির মধ্যে একটি জিনিস ছিল যাকে বলে 'সাজেসটিভনেস' বা জ্ঞাপকতা। অল্পবাক্যের মধ্যে এই-সব চৌপদীর কবিরা অনেকখানি ভাব ফুটিয়ে তুলতেন। ফার্সী কাব্যেও একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, কিন্তু সেটা

আরো প্রাণবন্ত, কারণ ফার্সী ভাষা সংস্কৃতের মতো কৃত্রিম সাধুভাষা ছিল না। রাধামোহন সেন সেযুগে 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামে একটি সংগীতশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি কাব্যে রচিত। এই গ্রন্থপাঠে জানা যায় তিনি ফার্সী ভাষায় রচিত 'বাগদর্পণ', 'তুহ্ ফাৎ উল্ হিন্দ' প্রভৃতি সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি উত্তম গীতরচয়িতাও ছিলেন—একটি নমুনা—

কেন ভুরু ধনু টান হানিবে কি বাণ,
কুরঙ্গ বধিতে বুঝি করিছ সন্ধান।
শুন হে তোমারে কহি, আমি তো কুরঙ্গ নহি,
কেবল আমার বদনে কুরঙ্গ নয়ান।।

এইরকম চৌপদী সংস্কৃত বা ফার্সী উভয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। গোপাল উড়ের যাত্রায় একটা গান আছে—

এখনো রজনী আছে তুমি কোথা যাবে রে প্রাণ।
নিশি যদি পোহাইত কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হত শশী যেত নিজ স্থান।।

এই রচনায় রীতিটি ফার্সী চৌপদীর প্রাণস্পর্শী আবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিধুবাবু লিখেছিলেন—

চন্দ্রাননে কি শোভা কমল নয়ান
ভুরুভৃঙ্গ ভঙ্গী করি করে মধুপান।
কেশবেশ কি তাহার, কিবা নীরদ আকার
মন শিখী তাহা দেখি হরিষে অজ্ঞান।।

এই লেখা পুরোপুরি সংস্কৃত চৌপদীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ওদিকে খেয়াল গানগুলিও এইরকম চৌপদীতে রচিত হত; টপ্পার আকার ছিল আরো ছোটো। এই-সমস্ত প্রভাব স্বীকার করে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠস্তরের গীতিকবিতা রচিত হয়ে আমাদের সংগীত এবং সাহিত্য উভয় শাখাকেই সমৃদ্ধ করেছে। অষ্টাদশ শতকে এসে আমরা বাংলার দুটি স্বকীয় ধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি—একটি ভারতচন্দ্রের নবগঠিত পয়ারছন্দে রচিত মঙ্গলকাব্য এবং অপরটি রামপ্রসাদের শাক্তগীতি, যার মধ্যে কীর্তন এবং লোকসংগীতের একটা সমন্বয় ঘটেছিল। এই পয়ারের ধারাটি চলে এসেছিল কবিগানে এবং পাঁচালিতে। রামপ্রসাদও দীর্ঘ পদ রচনা করেছেন এবং তাঁর অনেক গানে রাগের উল্লেখও পাওয়া যায়; কিন্তু সব মিলিয়ে সে-সব রচনা প্রধানত আধ্যাত্মিক এবং ভক্তিমূলক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অধ্যাত্মপদ বা ভক্তিগীতির অভাব আমাদের দেশে ছিল না সেই জয়দেবের আমল থেকে, কিন্তু সেগুলিকে কাব্যসংগীতের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী সম্পূর্ণভাবে সার্থকতা অর্জন করেছে কাব্যসংগীতের সংগঠনে। সাহিত্য এবং সংগীত উভয় দিক থেকে এর মূল্যই সর্বাধিক, এই কারণে বাংলা গানের উৎকর্ষ বিচার করতে হলে এই পর্যায়ের সংগীতই মুখ্য আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তা বলে, ভক্তি বা পরমার্থকে অধিকার করে যে বিরাট সংগীত-সৃষ্টি এই দুই শতাব্দীতে হয়েছে তাকে নির্বিচারে উড়িয়ে দিলে খুবই ভুল করা হবে। রামপ্রসাদের গানে ভক্তি ও বৈরাগ্যভাব থাকলেও আরো প্রচুর মানবিক আবেদন আছে যা বাঙালির অন্তরকে প্রভূতভাবে আকৃষ্ট করেছে। বহু গায়ক রামপ্রসাদের একাধিক গানকে উত্তম রাগসংগীতে পরিণত করেছেন গানগুলির অন্তর্নিহিত ভাবকে বজায় রেখে, কমলাকান্তের নানা গানেও এই রকম রাগের আরোপ ঘটেছে। রামমোহন রায় যে-সব গান রচনা করে ব্রহ্মসংগীতের সূত্রপাত করেন সেগুলিতেও এই মানবিকতাই প্রাধান্য অর্জন করেছে। ব্রহ্মের নামাঙ্কনেই তাঁর গানের একমাত্র আবেদন নয়, এবং তিনি সে চেষ্টাও করেন নি, বরঞ্চ মনঃশিক্ষা বা দেহতত্ত্বই তাঁর গানে বিশেষ আবেদন প্রকাশ করে সর্বজনীন সংগীত হয়ে উঠেছে। তাঁর গানকেও রাগসংগীতের রীতিতে গেয়ে আসা হয়েছে। কবিগানের ধারাকে সংগীতের মাধ্যমে একটা 'স্পোর্ট' বললে অত্যুক্তি হয় না। এর সাংগীতিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর এবং দুই কবির উত্তপ্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে যেটুকু সুরের ভাব ফুটিয়ে তোলা হত, তারও অবলুপ্তি ঘটত। কিন্তু আশ্চর্যর বিষয়—এই-সব কবিগানের কিছু কিছু অংশ উত্তম সংগীতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই-সব গান উচ্চশ্রেণীর গায়কেরা রাগসংগীতের রীতিতে গেয়ে আনন্দ পেতেন। উদাহরণস্বরূপ রাম বসুর একটি দীর্ঘ পদের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করি। এই অংশটি বিশিষ্ট কাব্যসংগীতে পরিণত হয়েছিল :

মনে রইল সই মনের বেদনা
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে
নির্লজ্জ রমণী বলে হাসিত লোকে
সখি ধিক্ আমারে ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না।।

একে আমার এ যৌবনকাল
তাহে কাল বসন্ত এল
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন আসি আসি সে আসি বলে
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়নজলে
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে
মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁইও না।।

এই গান কেউ কেউ ভৈরবীতে গেয়ে আসছেন, কেউ কেউ সিন্ধু-কাফিতে। লেখক বহুকাল পূর্বে যখন এই গানটি শেখেন তখন তাঁর বৃদ্ধ শিক্ষক এর সঞ্চারী অংশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কারণ তখনকার দিনে বাংলা গানে সঞ্চারীর সৃষ্টি খুব কমই করা হত। চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল এই যে, রাগসংগীতের ধারায় গাওয়া হলেও এর মধ্যে স্থানে স্থানে লোকসংগীতের কলাকৌশলও নিপুণভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এমনি আর-একটি লিরিক উত্তম টপ্পারূপে গাওয়া হয়ে এসেছে ওই সিন্ধু-কাফিতেই, সেটি রাসু-নৃসিংহের একটি বড়ো কবিগানের মধ্যে ধরে রাখা আছে :

শ্রীমতীর মন মানেতে মগন
ওখানে এখনো যেও না
বিষাদের বাতি জ্বেলেছেন শ্রীমতী
তাহাতে আহুতি দিও না।
নিবেদন করি ফিরে যাও হরি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকো না,
কত নারীর সঙ্গ করেছ কি রঙ্গ
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁও না।।

বহুদিনের জনশ্রুতি এই অংশ নিধুবাবুর রচনা এবং উল্লিখিত শ্রীমতী তাঁর প্রণয়িনী শ্রীমতী ছাড়া আর কেউ নয়। এই জনশ্রুতির সত্যতা নির্ধারণ করা শক্ত, কিন্তু গানটি পুরোপুরি একটি মধুর টপ্পা।

বাংলা গানে লোকসংগীতের আবেদন রাগসংগীতের সঙ্গে রফা করে অগ্রসর হয়েছে এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। এ-সব গানে তান বিস্তার করা সম্ভব অথচ লোকসংগীতের প্রয়োগগুলি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। এই ধরনের গানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যাবে দাশরথি রায়ের পাঁচালির গানগুলিতে; রসিক রায়ের পাঁচালি

থেকেও এরকম দু-চারটি গান সেকালকার বড়ো বড়ো গাইয়েরাও গাইতেন। শুধু যে পাঁচালিতেই এই জাতীয় গানের স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাই নয়, সেকালের যাত্রাগানেও এই রকমের উদাহরণের অভাব নেই; গোবিন্দ অধিকারী বা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের বেশ-কিছু গান আছে যেগুলি এককালে যাত্রার আসর থেকে বৈঠকী আসরে উঠে এসেছিল। এই প্রসঙ্গে কতগুলি সুরের উল্লেখ করতে হয় যেগুলি পাঁচালি বা যাত্রাগানে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিভাস, সুরটমল্লার, সিন্ধু-ভৈরবী, কালাংড়া, সিন্ধু-কাফি, পিলু-বারোঁয়া প্রভৃতি সুরগুলি বিশেষ বাঙালি ধরনে গাওয়া হত। বিভাসের একটি রূপ ছিল যাতে প্রায়ই ঝাঁপতালের প্রয়োগ হত; তার কারণ এই স্বরে একটি সুমধুর নাট্যরসের অবতারণা করা যেত। কিন্তু এ ছাড়াও বিভাস অন্যতাল অবলম্বন করে যথেষ্ট গাওয়া হয়েছে। নমুনাস্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করি; গানটি তেতালায় ঈষৎ ঢিমে লয়ে গাওয়া হত। এ গানের রচয়িতা বদন অধিকারী, যাঁর দলে গোবিন্দ অধিকারী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন :

শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না।
আমি কি রূপসী ছার আমা হতে আছে আর
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসি
পোহাইলে সারা নিশি
এখন প্রভাতে এলে দিতে মনবেদনা।
কত কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলীর মুখে
ওই চাঁদমুখের তুলনা হয় না—
সে চাঁদ চকোর হয়ে আছে ভূমে লুটাইয়ে
ছি ছি তা দেখিয়ে লাজ পাও না।

এই গানে যে অভিমানের ভাবটি ফুটেউঠেছে সেটি অন্য সুরে ফুটে উঠত কিনা সন্দেহ। এই বিভাসে বেশ-খানিকটা কীর্তনের ভাবও দেখা যায় এবং মাঝে মাঝে নিষাদের স্পর্শও অনুভূত হয়, তথাপি এটি তেতালায় বেশ মজা করে গাওয়া যায় এবং খোল, তবলা উভয়েরই উৎকৃষ্ট সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের একটি প্রসিদ্ধ গান—

তোমায় হেরে অঙ্গ জ্বলে
তুমি কি আশায় এখানে এলে
ফিরে যাও হে চিকন কালা

বাসি ফুলে কি মধু মেলে
গত নিশিতে কার কুঞ্জেতে
কোন ফুলেতে মজেছিলে
সখ্যভাবে মন রাখিতে
প্রভাতে আসি দেখা দিলে
ফিরে যাও হে রসময়
হয়েছে যে অসময়
বয়ে গেলে ক্ষুধার সময়
ভাল লাগে কি সুধা পেলে ইত্যাদি।

এটি ঝাঁপতালে গাওয়া হয় এবং এই গানেও বাংলায় প্রচলিত বিভাসে খুব নাটকীয়ভাবে একটা অভিমান সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এইরকম নাট্যরস সৃষ্টির জন্য বাংলায় আরো বহু পরিচিত রাগকেও অবলম্বন করা হয়েছে। একটি সুমধুর পুরাতন গান আছে খাম্বাজ-ঝাঁপতালে, রচয়িতা কে বলতে পারব না, তাতে একটা করুণ আবেদন প্রকাশ পেয়েছে বিবিধ বৈচিত্র্য নিয়ে। গানটি উদ্ধৃত করছি। এরকম আরো দু-একটি গান তুলে দিচ্ছি এইটা বোঝাতে যে এই রচনাগুলির কোনো-কোনোটি লিরিক হিসাবেও চমৎকারিত্বের দাবি করতে পারে :

কালো বরণ রাধা হেরিবে না বলেছে
তবে কেন ওগো বৃন্দে কুঞ্জে যেতে সেধেছে।
বোলো সখি তারে বোলো মাথার যে কেশ কালো
নয়নের তারা কালো তবে কেন রেখেছে।
আমি, বৃন্দাবন ত্যজিব বনে বনে ভ্রমিব
রাধারে বলিও কালা বাঁশি জলে ফেলেছে।

এই খাম্বাজেই আর-একটি নাট্যরসাত্মক গান উদ্ধৃত করছি। এটি এবং উপরেরটি ঠিক ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা কিনা সেটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারব না, তবে আঙ্গিকের দিক থেকে সম্পূর্ণ উক্ত শতাব্দীর লক্ষণ বহন করছে :

ছুঁও না কালা কালো হইবে মম অঙ্গ
পথ ছাড়ো ঘরে যাই গগনে আর বেলা নাই
ছি ছি কালা একি তব রঙ্গ।
আমরা গোপেরি নারী গোকুলে বসতি করি
করি নাকো পুরুষেরি সঙ্গ।

এই গানটি চতুর্মাত্রিক ছন্দে রচিত এবং কোনো কোনো প্রবীণ গায়কের মুখে এই গানটি রীতিমতো ওস্তাদি ঢঙে রূপায়িত হতে দেখেছি। পুরোনো বাংলা গানে হিন্দী ঠুংরির চাল বড়ো একটা দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তার বদলে ছোটো-ছোটো তান বিস্তারে এই ধরনের গানগুলি এক-একটি স্বকীয় স্টাইল স্থাপন করেছে। এই যে নাট্যরসের ভঙ্গি এটি সুদূরপ্রসারী হয়েছে; এমন-কি লালচাঁদ বড়াল তাঁর বহু মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও বহু গানেই নাট্যরসের অবতারণা করতেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান শুনেছেন তাঁরাও জানেন কবি মাঝে মাঝে কী অপূর্ব নাট্যরসের স্টাইল ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর নিজের গায়কীতে!

শ্রীধর কথকের একটি গান আছে, যেটি বেহাগে প্রচলিত। এটি নিশ্চয়ই যুক্ত হয়েছিল তাঁর কথকতায় কোনো নাটকীয় মুহূর্তে :

এখন করি কি উপায়
বাজারে মোহন বাঁশি
শ্যাম ঘটালে কি দায়—
একে তো ঘোর যামিনী
তাহে সব কুলকামিনী
লোকভয় মনে মানি
না দেখি উপায়। ইত্যাদি।

শ্রীধর কথকেরই আরো একটি বিখ্যাত বেহাগ হচ্ছে—'সখি আমায় ধর ধর', যে গান বহু প্রাচীন গায়কেরই জানা ছিল। এই গানগুলিতে বাংলায় প্রচলিত বেহাগের সব লক্ষণই রয়েছে, কিন্তু বাড়তি কিছু আবেদন আছে যা ঠিক রাগসংগীতের গায়কীতে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে কাব্যসংগীতের স্টাইলে। দাশরথি রায়ের 'রাই অঙ্গ সাজাব দিয়ে কি ভূষণ' অথবা রসিক রায়ের 'দে গো বৃন্দে আমায় দে যোগী সাজায়ে'—এই-সব সিন্ধু-কাফিতেও একই কথা খাটে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় একটি ভৈরবী ছিল—'তোরা যাসনে যাসনে যাসনে দূতী। গেলে কথা কবে না সে নবভূপতি।' এই গানটি যাত্রার আসর থেকে তুলে এনে অনেক গায়ক বৈঠকী আসরের গানে সংযোগ করতে দ্বিধা করেন নি। নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের যাত্রায় গাওয়া সুরট-মল্লারে 'আমায় দে গো মোহন চূড়া বেঁধে'—এই গানকেও রাগসংগীতের ঢঙে গাইতে শোনা যেত। গোপাল উড়ের যাত্রায় বহুতর কালাংড়া সুরের গান তো বিখ্যাত হয়ে আছে। 'ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া' একদা গায়ক মাত্রেই জানতেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ১৮৭৩ সালের অপেরা 'সতী কি কলঙ্কিনী'-র কথা! এর

গানগুলিও বিচিত্র টপ্পার ধরনে গাওয়া হত। 'ধর হে রাজবালা এনেছি মালা সুচিকন' সেই সময়কার অতি বিখ্যাত গানগুলির অন্যতম। এই রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রদর্শন করা যায়। কিন্তু এবারে যে-সব রচয়িতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আমাদের কাব্যসংগীতকে রাগসংগীতের মাধ্যমে একটি নতুন গীতকলায় উত্তীর্ণ করেছিলেন তাঁদের প্রসঙ্গে আসি।

রামনিধি গুপ্ত, রাধামোহন সেন এবং কালিদাস চট্টোপাধ্যায়—এই তিনজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বাংলার কাব্যসংগীতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনজনেই সুশিক্ষিত ছিলেন, তবে রাধামোহন সেন ছিলেন তদুপরি পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর রচিত 'সংগীততরঙ্গ' গ্রন্থটিকে বাংলার আদি সংগীতশাস্ত্র বলা চলে। এই গ্রন্থটি যে কেবল সংস্কৃত ও ফার্সী গ্রন্থাদির আহরণ, এই রকম মনে করলে ভুল হবে; তাঁর স্বকীয় চিন্তার স্বাক্ষরও তিনি এই গ্রন্থে রেখেছেন। এতদ্ব্যতীত বহু সুললিত লিরিক রচনা করে তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছিলেন। এঁদের তিনজনেরই রচনার ধরন-ধারণ একই রকম এবং প্রধানত টপ্-খেয়াল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই এতদ্দেশে খেয়াল গানের প্রচলন হয় এবং ক্রমে তাতে টপ্পার স্টাইল প্রবর্তিত হতে থাকে। আগে খেয়াল গানের দুটি ধারা ছিল; একটিতে ধ্রুপদী রীতি এবং তানের প্রয়োগ স্বল্প হত, অপরটিতে স্বাধীনতার পরিমাণ বেশি ছিল এবং তানবিস্তার অধিক পরিমাণে যুক্ত হত। বাংলায় দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং সহজেই টপ্পার সঙ্গে যুক্ত করে তাকে টপ্-খেয়ালে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল। অনেকেই এই কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন, কিন্তু সর্বাধিক সার্থকতা লাভ করেন রামনিধি গুপ্ত যিনি নিধুবাবু নামে পরিচিত। এখানে একটা প্রশ্ন মনে উদিত হয়, কেন বাঙালি গায়কগণ টপ্পার দিকে এতটা মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং কেনই বা তাঁরা ধ্রুপদ রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। বাংলায় কিন্তু হিন্দু ধ্রুপদের চর্চা খুব বেশি পরিমাণে হয়েছে এবং একদা বাংলার ধ্রুপদীরা সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সকলেই জানেন বিষ্ণুপুর ধ্রুপদের পীঠস্থান। ঊনবিংশ শতকে এবং বর্তমান শতকেও একাধিক বিষ্ণুপুরের গায়ক সারা ভারতে ধ্রুপদ গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। অতএব, হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ বাঙালিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, একথা সর্বথা স্বীকার্য; কিন্তু সেই ধ্রুপদীরাই যখন বাংলা গান গাইতেন তখন তাঁরা হয় বাংলা টপ্-খেয়াল নয় টপ্পা গাইতেন। এ ছাড়া, পূর্বোল্লিখিত নানাপ্রকার গানও গাইতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করতেন না। এর একটি প্রধান কারণ হল এই যে বাংলা ভাষায় টপ্পার লালিত্য যেভাবে ফুটে উঠেছিল এমনটা আর কোনো পর্যায়ের রীতির প্রয়োগে দেখা যায় নি। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাংলার সংগীত রচয়িতারা এটা

উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলা গানকে ঠিক হিন্দুস্থানী রীতিতে উপনিবদ্ধ করলে ভুল করা হবে। পূর্বযুগে মিথিলা যেমন তাদের মৈথিলী ভাষা নিয়ে স্বাধীনভাবে রাগসংগীতের সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, বহুদেশও সেইভাবে বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতি অনুসারে নিজের চিন্তা প্রয়োগ দ্বারা রাগসংগীতের সংগঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এঁরা তখনই উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দুস্থানী গানের সার্বিক অনুকরণে বাংলা গানের শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্ভব নয়, কারণ সমস্ত উন্নত ভাষারই একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে যেটা তার নিজস্ব একটা শৈলীকে খুঁজে নিতে চায়। এ যুগে বাংলায় এই কাজের উপযুক্ত একাধিক স্রষ্টা সংগীতজ্ঞ ছিলেন, যাঁরা বাংলার সংগীতে এই সাফল্য এনে দিতে পেরেছিলেন। এতে তাঁরা শুধু বাংলা গানেরই নয়, বাংলা সাহিত্যেরও সমৃদ্ধিসাধন করেছিলেন। এই প্রচেষ্টা এত সার্থক হয়েছিল যে, অব্যবহিত পরের যুগে শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, আরো বহু সংগীত-রচয়িতাই এঁদের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নিধুবাবু যে কেবলমাত্র কতিপয় বাংলা টপ্পা রচনা করেছিলেন তাই নয়—আখড়াই গানের উদ্ভাবনা করে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে যন্ত্রসংগীতেও ঐকতানের প্রথম পরিকল্পনার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে এই আখড়াই গানের প্রসঙ্গে পরিকল্পিত ঐকতানই বহু বিখ্যাত কনসার্ট বা অর্কেস্ট্রার প্রেরণা প্রদান করেছিল। এই যে স্বাধীন চিন্তা বা বাংলা গানের উন্নতিকল্পে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়া এটা কিছুকাল ধরে চললেও একটা ধারাবাহিকতা রেখে যায় নি। বাঙালি গায়কদের হিন্দী গানের প্রতি আসক্তিটা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর অপরার্ধে, যখন নবাব ওয়াজিদ আলী শা কলকাতার মেটেবুরুজে বন্দীজীবন যাপন করেছিলেন। এই সময়টা ব্রিটিশ শাসনের সুদৃঢ় অবস্থানের যুগ, যখন কলকাতা সারা ভারতের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই বিভিন্ন প্রদেশের ওস্তাদগণ কলকাতায় আসতেন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে এবং বাঙালি গায়কগণও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন হিন্দুস্থানী সংগীতে পারদর্শিতা অর্জনের অভিপ্রায়ে। তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁদের অংশীদাররূপে প্রধানত হিন্দী গানের চর্চাতেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে লাগলেন। অনেকে বাংলার বাইরে দীর্ঘকালের জন্য চলে যেতে লাগলেন হিন্দুস্থানী সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্যে। যদিও তাঁরা তখনো বাংলার রাগসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং বিভিন্ন আসরেও বাংলা গান গাইতেন, তথাপি আগেকার সেই নিষ্ঠা আর তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হত না। ক্রমে নতুন রচয়িতারও অভাব ঘটতে লাগল, কেবল ভাগ্যক্রমে বাংলা গান যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, সেটা

অনেকের যত্নে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর সেই দুর্ভাগ্যই বাঙালি জাতির ওপর নেমে এল অনিবার্যভাবে। আগে বাংলায় সংগীত সাধনার মাধ্যম ছিল বাংলা গান, কারণ বাংলায় রাগসংগীতের অভাব ছিল না।

শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্বরসাধনার পর বাংলা গান দিয়েই সংগীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করত।

এমন-কি বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকেও এই ধারাটাই প্রচলিত ছিল। তখনো ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি গীতিকারদের গান দিয়ে শিক্ষা আরম্ভ করত।

তৃতীয় দশক থেকে যখন হিন্দী গানের বিদ্যালয় গড়ে উঠতে লাগল এবং ডিগ্রি, ডিপ্লোমা লভ্য হতে লাগল তখন বাংলার বহু মেধাবী শিক্ষার্থী তাদের পদ্ধতিতে কেবলমাত্র হিন্দী গানকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে দ্বিধা বোধ করল না। তারা বাংলার রাগসংগীতের পরিবর্তে হিন্দী লক্ষণগীত শিখে বিভিন্ন রাগকে চিহ্নিত করতে শিখল; কিন্তু বাংলা গান তাদের চিত্তে যে কাব্যবোধ এবং একটা স্বতন্ত্র লালিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সক্ষম হত সেই পথটাই তাদের কাছ থেকে চিরতরে সরে গেল। এর ফলে যেটা ঘটল সেটা একটা বিরাট ট্র্যাডিশনের অবলোপ। ঊনবিংশ শতাব্দীর এত বড়ো সংগীতভাণ্ডার কোথায় চাপা পড়ে গেল কেউ তার ঠিকানা অনুসন্ধান করেও দেখল না এবং আগের প্রজন্মগুলিতে কত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিন্তাভাবনা আমাদের সংগীত জগৎকে উজ্জীবিত করেছিল তার কোনো খবরই এ যুগের গায়ক-গায়িকাদের অনুপ্রাণিত করল না। আজ আমরা বাংলা খেয়াল গাওয়া হবে না কেন এই নিয়ে আন্দোলন করছি, কিন্তু আমরা কি জানি যে, বাঙালি ওস্তাদ গাইয়েরা যখন হিন্দী খেয়াল শিখেছিলেন তখন তাঁরা নানা কারণে বাংলার রাগসংগীতকে হিন্দী খেয়ালের দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে গঠন করতে আদৌ উৎসাহী হন নি; তার বদলে তাঁরা তাঁদের শিক্ষিতপটুত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ ওরিজিনাল একাধিক রীতির বাংলা রাগসংগীত প্রণয়ন করেছিলেন। আজ আমরা 'রাগপ্রধান' নাম দিয়ে একপ্রকার গান রচনা করছি যার সমস্ত কলাকৌশল হিন্দী খেয়াল-ঠুংরির বিশ্বস্ত অনুকরণ বললে অত্যুক্তি হয় না। এমনটা যে হয়েছে তার কারণ আমরা হিন্দী খেয়াল-ঠুংরিকে জানি কিন্তু নিজেদের সংগীতের ঐতিহ্যকে জানি না। যদি সেটা জানতুম তা হলে বাংলা গানে নিজেদের প্রতিভা দিয়ে আর-একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ নতুন সৃষ্টি গড়ে তুলতে পারতুম; এমন করে অপর একটা সংগীতধারার অনুকরণ করে তাকে একটা নতুন নামে চালাতে চাইতুম না।

বাংলার টপ্পার কথা বিশেষ করে বলেছি, বলেছি অন্যান্য নানান ঢঙের কথা; কিন্তু এ ছাড়াও যাকে আমরা রাগধর্মী কাব্যসংগীত বলি তার সৃষ্টিও গত শতাব্দীতে নেহাত কম হয়নি। এগুলি টপ্পা নয় বা টপ্-খেয়ালও নয়, কেবলমাত্র রাগের আরোপে রচিত লিরিক গান। উদাহরণ অনেকগুলিই দিতে ইচ্ছে করে; কিন্তু কী হবে দিয়ে, স্বরলিপি তো দেওয়া যাচ্ছে না, পরন্তু স্বরলিপিতে এ-সব গানের চমৎকারিত্বকে ফুটিয়েও তোলা যায় না। এই-সব গান গাওয়া কিন্তু খুবই কঠিন এবং যে-সব তবলিয়া হিন্দী রাগসংগীতের রীতিতে কাটা কাটা মাত্রায় ঠেকা দিতে অভ্যস্ত তাঁরাও অসুবিধা বোধ করবেন, কারণ এ-সব গানের ছন্দ ঠিক ঐ রকম অভ্যস্ত রীতিতে চলত না—গানের লয়টা যেন সুর এবং কথার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে চলতে থাকত এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সমে এসে পড়ত একটা পদ সমাপ্ত হবার পূর্বমুহূর্তে। বাংলার টপ্পা যাঁরা প্রবীণ গায়কদের যৎ-এ গাইতে শুনেছেন, এই কৌশলটা তাঁরা অনেকটা উপলব্ধি করতে পারবেন। তালটা হয়তো চতুর্মাত্রিক অথবা ত্রিমাত্রিক, এমন-কি ঝাঁপতালও হতে পারত, কিন্তু তার বিন্যাসটা এমনভাবে ঘটানো হত, যাতে কাব্যের সঙ্গে সেটাকে কিছুতেই আলাদা করে ভাবা যেত না। বলা বাহুল্য, খুব পাকা গাইয়ে না হলে এ-রকম দক্ষতা সহকারে গান করা সম্ভব ছিল না। আসলে, যাঁরা সে যুগে বাংলা গান রচনা করতেন তাঁরা আগে রাগসংগীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করতেন, তার পর সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলা গানের আবেদনকে স্বীকার করে তবে তাঁদের স্বকীয় রচনায় অগ্রসর হতেন। এ যুগে অত্যন্ত বিখ্যাত গায়কদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে এই ধরনের গানের কিছুটা পরিচয় দিতে দেখেছি; কিন্তু তিনিও অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দী খেয়ালের ঢঙে তাল সন্নিবেশ করতেন এবং তানগুলি হিন্দী ঢঙেই যোগ করতেন। তাঁর গাওয়া 'বোলো না ভুলিতে বোলো না' এই বেহাগে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সেকালের বেহাগের গায়কী ফুটে উঠেছে। গানটি বিগত তিরিশের দশকে রচিত; কিন্তু সুরসংযোগ জ্ঞানবাবুর অভিজ্ঞতাও যে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই বেহাগের গায়কীতে একটি পুরাতন বাংলা বেহাগের কথা মনে পড়ল। গানটি সাতুবাবু রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায় :

হেরিব না কালোবরণ
মুছাইয়ে দে গো তোরা
আমার নয়ন অঞ্জন।
যে যে সখি কালো আছে
তাদের আসিতে দিও না কাছে
আমার কৃষ্ণ মনে পড়ে পাছে

হেরিলে বদন।
কোকিল তমাল পরে
যদি কুহু রব করে—
বোলো তারে স্থানান্তরে
করিতে গমন।

এই সাতুবাবু, যিনি রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, তাঁর রচনা বলে পরিচিত একাধিক উত্তম রাগসংগীত পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই এঁর জন্ম হয়েছিল। এঁর একটি ঠুংরি চালের গান আমি শিখেছিলুম কালীপদ পাঠক মহাশয়ের কাছ থেকে—এটি পিলুতে রচিত :

স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন,
না করি বিচ্ছেদ ভয়ে আঁখি উন্মীলন।
নিদ্রাতে তাহারে দেখি মন প্রাণ হয় সুখী
স্বপন স্বপন হলে না রবে জীবন।।

এই ধরনের ঠুংরি রীতির গান পুরাতন বাংলার সংগীতে বিরল। এই রকম বিভিন্ন রাগে রচিত পুরাতন রাগসংগীতের বহু নমুনাই দেখানো যেতে পারে যেগুলিতে বহুতর প্রয়োগ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানবাবুর প্রসঙ্গে তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা মনে পড়ল। তিনিও রাগধর্মী বাংলা গানে একটি স্বকীয় পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। অনেকেই তাঁর রচিত গানের সঙ্গে পরিচিত নন, কিন্তু তিনি বাংলা গান সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। শেষের দিকে কনফারেন্সগুলিতেও তিনি এরকম কিছু বাংলা গান শোনাতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা একালের রাগপ্রধান গাইয়েদের মধ্যে দেখা যায় না, সেরকম সংগীতচিন্তার অধিকারী হলে এ যুগেও রাগধর্মী বাংলা গানে একটা নতুন গতি সঞ্চারিত হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গানের এই যে আলোচনা হল, এ থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে হিন্দী গানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গানের প্রকৃতি এবং স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ। যাঁরা হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাঁরা বাংলা গানকে তার অনুকৃতি করে তুলতে চান নি, অথচ বহু ক্ষেত্রে তার প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন। এমন-কি, কবিওলা, পাঁচালিকার এবং যাত্রাওলাদের বিবিধ রচনাও সংগীত সমাজে স্বীকৃত হয়েছে, তাদের যে একটা স্বকীয়তা ছিল সেটাও আজকের সাহিত্যিক এবং সাংগীতিক মূল্যায়নে সমাদৃত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে গিরিশচন্দ্র যখন নাটকের গান রচনা করতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর নিয়োজিত সুরকারগণ এঁদের রচনা থেকেই প্রেরণা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

গানে তো বরাবরই উনিশ শতকের প্রথম যুগের বহু রচনাশৈলী প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ঐতিহ্যের কিছুটাও চলে এসেছিল বলে পরবর্তী প্রধান প্রধান সংগীতরচয়িতাগণ বাংলা গানে তাঁদের স্বকীয়তা স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কেউ যেন এই লেখককে ভুল না বোঝেন যে, কেবল প্রাচীনপন্থী হবার পরামর্শই তিনি দিয়ে চলেছেন, তাঁর বক্তব্য শুধু এইটুকুই যে অগ্রগামী হতে গেলে পুরাতন সৃষ্টিকে, তার প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে হয়; তা নইলে যে বস্তু রচিত হবে সেটার মধ্যে কোনো চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে না, এবং সুচিন্তিত না হলে কোনো সৃষ্টিই যথার্থ স্বকীয়তাসম্পন্ন আর্টের স্বীকৃতি পায় না। আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি তাতে হিন্দী খেয়ালের প্রায় অন্ধ অনুকৃতি ছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্য বাংলা গানের মধ্যে চোখে পড়ছে না; এমন-কি প্রায় গানের বাঁধুনিও সেই একই ছকে গড়া। আজকাল কনফারেন্সগুলিতে যেভাবে তান-বিস্তার-সরগম প্রয়োগ করে গান করা হয়, বাংলার রাগসংগীতে সেটাই অনুসৃত হয়ে চলেছে। বরঞ্চ, এর পূর্ব যুগে যখন শচীন দেববর্মণ, হিমাংশু দত্ত প্রমুখ সুরকারগণ বাংলা গান কম্পোজ করেছেন, তখন তাঁদের প্রয়োগরীতিতে যথেষ্ট চিন্তা ছিল, প্রভূত স্বকীয়তা ছিল। সেটা এসেছিল এই বোধ থেকে যে বাংলা গান বাঙালি জাতির মতোই একটা আলাদা শ্রেণী; রাগসংগীত হলেও তার প্রকৃতি খানিকটা অন্য নিয়মে চলবেই। হিমাংশুবাবু বহু বাংলা গান হিন্দী গানের ছকে রচনা করেছেন; কিন্তু সে-সব গান অনুকৃতি হয় নি, প্রতিভাবান কম্পোজারের স্পর্শে স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অ্যাকাডেমিক রীতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংগীতকে অনুশীলন করলে দেখা যাবে—লোকসংগীতের বহু বৈচিত্র্যকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্যসংগীতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার রাগসংগীতের নানা বৈচিত্র্য জনপ্রিয় লোকসমাদৃত গানগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। এই শতাব্দীতেই একটা বিশাল নাট্যসংগীত গড়ে উঠেছে এবং কাব্যসংগীতেরও নবরূপায়ণ ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর এই চুরাশি বৎসর ধরে আমরা কি সৃষ্টি এবং উদ্যমের দিক থেকে সেই তুলনায় বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার সন্ধান দিতে পেরেছি? বরঞ্চ একটা বিরাট ঐতিহ্য থেকে ক্রমেই বিচ্যুত হয়েছি। 'অবক্ষয়' শব্দটি ব্যবহার করলে বহু পাঠকপাঠিকাই বিরক্ত হবেন, কিন্তু একটা জাতির অবক্ষয় না ঘটলে সে তার ঐতিহ্যকে হয়তো এমন করে বিলুপ্ত হতে দিত না। এই শতাব্দীর হাল আমলে যেটা আমাদের বাহবা পাচ্ছে সেটা যতটা ধ্বনির সঙ্গে কৌশলের প্রয়োগ, ততটা কলার সৌকর্য বা সৃষ্টি নয়। এর ফলে, আমাদের সংগীতও পাশ্চাত্য ধরনধারণের মতন 'লাউড' হয়ে উঠেছে এবং আগামী শতাব্দীর জন্যে আমরা সেই ধ্বনিসর্বস্ব সংগীতের ঐতিহ্যই রেখে যাচ্ছি।